মৃগাঙ্কবাবুর ঘটনা

story,
SATYAJIT RAY

illustration,
DIBYENDU KHAN

a project by,
DIBYENDU KHAN
166450008

under guidence of,
Prof. G.V.SREEKUMAR

মৃগাঙ্কবাবু তাঁর সহকর্মী সলিল বসাকের কাছে থেক প্রথম জানতে পারলেন যে বাঁদর থেকে মানুষর উদ্ভব হয়েছে। এ খবর আজকের দিনে শিক্ষিত লাকমাএই জানে, কিন্তু ঘটনাচক্রে খবরটা মৃগাঙ্কবাবুর গোচরে আসেনি। আসলে তাঁর জ্ঞানের পরিধিটা নেহাতই সংকীর্ণ। ইস্কুলে মাঝারি ছাএ ছিলেন, পাঠ্যপুস্তকের বাইরে কোনও বই পড়তেন না, পরেও বই পড়ার অভ্যাসটা একবারই হয়নি।

ঠিক তাই, লক্ষ লক্ষ বছর আগে মানুষ ছিল এক শ্রেণীর চতুস্পদ বাঁদর। বাঁদর জাতটা অবিশ্যি এখন ও আছে, কিন্তু যে শ্রেণীর বাঁদর থেক মানুষের উদ্ভব হয়ছে সে শ্রেণী লোপ পেয়ে গেছে ।

মৃগাঙ্কবাবু এবং সলিলবাবু দু'জনই হার্ডিঞ্জ ইন্ডিয়া কোম্পানিতে কেরানগিরি করেন। মৃগাঙ্কবাবু বাইশ বছর হল কাজ করছেন, আর সলিল পনেরো; দু'জন পাশাপাশি টেবিল বসেন, তাই একটা বন্ধুত্ব গড়ে উঠছে, না হলে মৃগাঙ্কবাবু মোটই মিশুকে লোক নন।

বাঁদর থেক মানুষ হওয়ার খবরটা মৃগাঙ্কবাবুর মন গভীরভাবে রেখাপাত করল। তিনি কলেজ স্ট্রীটে বইয়ের দোকান ঘেটে একটা বিবর্তনর বই জোগার করে পড়ে ফেললেন। সলিল ভূল বলেনি। ছাপার অক্ষরে তথ্যটা দেখে মৃগাঙ্কবাবু আর সেটা উড়িয়ে দিতে পারলেন না। আশ্চর্য- বাঁদর থেকে মানুষের আসত এত লক্ষ বছর লেগেছে! আদিম অবস্থাটা, এবং পরিবর্তনের ব্যাপারটা এখনও কিছুটা অন্ধকারে রয়েছে, তবে এ- ব্যাপারে প্রাণিবিদ্‌রা গবেষণা চালিয়ে যাছেন। মানুষ ও বাঁদর, এই দুই-এর মাঝামাঝি অবস্থাকে যে বলা হয় মিসিং লিঙ্ক, এ খবরও মৃগাঙ্কবাবু জানলেন।

কিন্তু এতই মৃগাঙ্কবাবুর আশা মিটল না। তিনি প্রথমে জাদুঘরে গেলেন আদিম মানুষের মূর্তি আর তার হাড়গোড় দেখতে। দেখে বুঝলেন যে, আদিম দ্বিপদ মানুষের চেহারার সঙ্গে বাঁদরের চেহারার বিশেষ মিল ছিল।

তারপর মৃগাঙ্কবাবু গেলেন চিড়িয়াখানায়। সেখানে অনকক্ষণ ধরে মনোযোগ দিয়ে দেখলেন। এক হল লেজবিশিষ্ট 'মাঙ্কি', আর আরক হল লেজবিহীন 'এপ'। এর মধ্যেও নানারকম শ্রেণী। দিশি বাঁদর আর হনুমানের বাইরে রয়েছে আফ্রিকার গোরিলা, শিম্পাঞ্জি, বেবুন ইত্যাদি, আর তা ছাড়া আছে সুমাত্রার ওরাং বা বনমানুষ। এই যে মানুষ কথাটা জুড়ে দেওয়া হয়েছে এটা মৃগাঙ্কবাবুর কাছে খুব অর্থপূর্ণ বলে মনে হল।

তাঁর আরও মনে হল যে, সবরকম বাঁদরের মধ্যে আফ্রিকার শিম্পাঞ্জির সঙ্গেই মানুষের সবচেয়ে বেশি মিল। শুধু তাই না, একটি শিম্পাঞ্জি তো মৃগাঙ্কবাবুর সম্পর্কে বিশেষ কৌতুহলী বলে মনে হল। বারবার তাঁর দিকে চাওয়া, এগিয়ে এসে খাঁচার শিক ধরে দাঁড়িয়ে তাঁর দিকে চেয়ে মুখভঙ্গি করা, এমনকী দাঁত বার করে হাসা পর্যন্ত। মৃগাঙ্কবাবুর মনে হচ্ছিল যেন জানোয়ারটিকে তিনি অনেক দিন ধরই চেনেন।

চড়িয়াখানায় ঘন্টাখানক কাটিয়ে বাড়ি ফেরার পথে মৃগাঙ্কবাবুর হঠাৎ কালুমামার কথা মনে পড়ে গেল, মৃগাঙ্কবাবুর যখন বছর পঁচিশেক বয়স তখন কালুমামা একবার কিছুদিনের জন্য তাদের বাড়িতে এসে ছিলেন।

তখন তিনি মৃগাঙ্কবাবুকে মর্কট বলে সম্বোধন করতেন।

এই মর্কট, মোড়ের দোকান থেকে সিগারট আন তো।

মৃগাঙ্কবাবু একদিন না জিজ্ঞেস করে পারেননি।

আচ্ছা কালুমামা, তুমি আমায় মর্কট বলো কেন?

কালুমামার উত্তর দিতে সময় লাগেনি।

তোর চেহারাটা মর্কটের মতো তাই। আয়নায় নিজের মুখ দেখও বুঝতে পারিস না? কপাল ছোটো, কুতকুতে চোখ, নাক আর চোখের মাঝখানে এতবড় ফাঁক-মর্কট বলব না তা কী বলব? তোর হাতের আংটিটায় যে 'এম' লেখা রয়েছে সেটা আসলে মৃগাঙ্ক নয়-ওটা মর্কট। অথবা মাঙ্কি। তোর আর চাকরি খুঁজতে হবে না- চিড়িয়াখানায় খাঁচায় তোর জন্য ভেকেন্সি রয়েছে সবসময়।'

মৃগাঙ্কবাবু অবিশ্যি এর পর আয়নায় নিজের চেহারাটা খুব ভাল করে দেখেছিলেন। কালুমামা খুব ভুল বলেননি। একটা বাঁদুরে ভাব আছে বটে তার চেহারার মধ্যে।

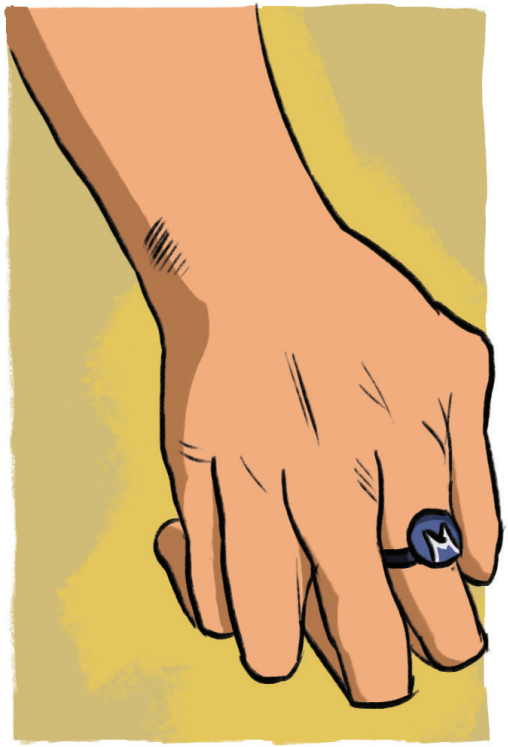

শুধু মুখে নয়, পিঠে একটা কুঁজো ভাব, তার শরীরে লোমর আধিক্য- এ দুটোও তাকে কিছুটা বাঁদরের কাছাকাছি এনে দেয়। সলিলের কথাটা আবার মনে পড়ল। সুদূর অতীতে যে বানর থেকে মানুষের উদ্ভব হয় তার কিছুটা ছাপ এখনও মৃগাঙ্কবাবুর চেহারায় রয়ে গেছে। চিন্তাটা তাকে বিব্রত করতে লাগল।

আপিসে টাইপ করতে করতে মনে হয়-আমার মধ্যে বিবর্তন পুরো হয়নি, আমার মধ্যে খানিকটা বাঁদর এখনও রয়ে গেছে। কিন্তু পরক্ষণেই মনে পড়ে - বাঁদর কি আপিসে ডেস্কে বসে টাইপ করতে পারে? তার চহারার সঙ্গে বাঁদরের যেটুকু সাদৃশ্য সটা সম্পূর্ণ আকস্মিক। সেরকম তো অনেক লোকর চেহারার সঙ্গেই তো জানোয়ারের মিল আছে। অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টের সুরেশবাবুর মুখের সঙ্গে তো ছুঁচোর আশ্চর্য সাদৃশ্য। মৃগাঙ্কবাবু ষোলা আনাই মানুষ। এ নিয়ে কোনো সন্দেহ প্রকাশ করার কোনো কারণ থাকতে পারে না ।

এরই মধ্যে একদিন মৃগাঙ্কবাবুর খেয়াল হলো যে তিনি কলা আর চিনেবাদামের বিশেষ ভক্ত। আপিস থেকে ফেরার পথে রোজই দুটোর একটা কিনে খান। আর এ দুটোই হলো বাঁদরেরও প্রিয় খাদ্য। 'এই বাঁদর তুই কলা খাবি? জয় জগন্নাথ দেখতে যাবি?'- ছেলবলার এই ছড়াটা তার মাথায় ঘুরতে লাগল। এই মিলটাও কী আকস্মিক? নিশ্চয়ই তাই। কলা তো অনেকেই খায়, আর চিনেবাদামও খায়। মৃগাঙ্কবাবু চিন্তাটা জোর করে মন থেকে দূর করে দিলেন। কিন্তু যতই স্বাভাবিক হওয়ার চষ্টা করুন না কেন, মৃগাঙ্কবাবুর চিন্তাটা কিছুতেই যেতে চায় না।
বাঁদর থেকে মানুষ... বাঁদর থেকে মানুষ... আমি কী তাহলে পুরোপুরি মানুষ হইনি? আমার মধ্যে কী বাঁদরত্ব খানিকটা রয়ে গেছে?

টাইপিং এ ভুল হতে লাগল, আর এবার মেজোসাহেবের কাছ থেকে ডাক পড়ল।
আপনার কী হয়েছে বলুন তো?' আগে তো আপনার টাইপিং-এ ভুল থাকত না। আজকাল এটা হচ্ছে কেন?
কদিন শরীরটা একটু খারাপ হয়েছিল স্যার।
তা হলে ডাক্তার দেখান। আপিসের ডাক্তার তো রয়েছেই। ডাঃ গুপ্তকে বলুন।
না স্যার। তার দরকার হবে না। আর ভুল হবে না, আমি কথা দিচ্ছি। আমার ত্রুটি মাফ করবেন স্যার।

মেজোসাহেব মৃগাঙ্কবাবুর কথা মেনে নিলেন, কিন্তু মৃগাঙ্কবাবু নিজে মনে শান্তি পেলেন না। তিনি ডাঃ গুপ্তর শরণাপন্ন হলেন।
আমায় একটা কোনও ওষুধ দিন তো, যাতে আমার অন্যমনস্কতা কিছুটা কমে। কাজে বড় অসুবিধা হচ্ছে।
আপনার চেহারাটাও দেখে ভাল লাগছে না। আপনার ওজন কমেছে, চোখর তলায় কালি পড়ছে। শুধু ওষুধে তো কাজ হবে না। আপনার ছুটি পাওনা আছে ?
তা আছে। আমি গত দু'বছর ছুটিই নিইনি।
তা হলে দিন সাতেকের ছুটি নিয়ে কোথাও ঘুরে আসুন। আপনার চেঞ্জের দরকার। অবিশ্যি আমি একটা ওষুধ লিখে দিচ্ছি, কিন্তু ওষুধে কাজ হব না।
মৃগাঙ্কবাবু দশদিনের ছুটি নিলেন। কাথায় যাওয়া যায়?

কাশীতে তাঁর এক খুড়তুতো ভাই থাকেন। চৌষট্টি ঘাটের উপরের বাড়ি। চব্বিশ ঘন্টা গঙ্গার হাওয়ায় উপকার হবার সম্ভবনা আছে। ভাই মৃগাঙ্কবাবুকে অনেকবার যেতে লিখেছেন, কিন্তু যাওয়া হয়ে ওঠেনি। মৃগাঙ্কবাবু কাশীই যাওয়া স্থির করলেন।

কাশীতে যে চতুর্দিকে এত বাঁদর সেটা মৃগাঙ্কবাবুর খেয়াল ছিল না। রাস্তায় ঘাটে বাড়ির ছাদে গাছের ডালে মন্দিরের গায়ে সর্বত্র বাঁদর।ভাই নীলরতনকে বলাতে তিনি বললেন,

ভাইয়ের সঙ্গে দূর্গাবাড়িতে গিয়ে মৃগাঙ্কবাবুর চক্ষু চড়ক গাছ হয়ে গেল। ফটক দিয়ে চরে ঢুকতেই প্রায় পঞ্চাশ-ষাটটা বাঁদর দিক থেক ওদিক থেক ছুটে মৃগাঙ্কবাবুকে ঘিরে ধরল-তাদের কিচির-মিচির শব্দে কান পাতা যায় না।

দাঁড়ান-চিনেবাদাম কিনে আনি

আশ্চর্য এই যে, বাঁদরের মধ্যে পড়েও মৃগাঙ্কবাবুর অসোয়াস্তি লাগছিল না। এসব বাঁদর যেন সকলই তাঁর চেনা! অনেকদিন বহু আপনজনের মধ্য এসে পড়েছেন তিনি ।

নীলরতন একটা ব্যাঙ্কে চাকরি করেন। মৃগাঙ্কবাবু দুর্গাবাড়িতে গিয়েছিলন কাশী আসার তিনদিন পর। পঞ্চম দিনে তিনি প্রথম অনুভব করলেন যে তিনি কথা বলার সময় খেই হারিয়ে ফেলছন। তাঁকে বারবার 'ইয়ে' বলতে হচ্ছ। অতি সহজ সাধারন বাংলা কথাও তিনি ভুলে যাচ্ছেন।

মৃগাঙ্কদা, আজ দশাশ্বমেধ ঘাটে ভাল কেৰ্তন আছে। আমি আপিস থেকে ফিরে তোমায় নিয়ে যাব।

মৃগাঙ্কবাবুর কানে 'কেৰ্তন' কথাটাও কেমন অচেনা মনে হলো।

কোথায় যাবার কথা বলছিস?

দশাশমেধ ঘাট। যাবে?

ইয়ে- দশা-দশাশ্বমেধ ঘাট। কেন? সেখান কী আছে?

বললাম যে- আজ সন্ধ্যায় ভাল কেৰ্তন আছে। তোমার খুব ভাল লাগবে। তুমি তো কেৰ্তনর খুব ভক্ত ছিলে।

ও- কেৰ্তন। ইয়ে -তা যারা করবে কেৰ্তন তারা মানুষ তো?

এ আবার কী কথা মৃগাঙ্কদা- মানষে ছাড়া কী বাঁদরে করবে নাকি কেৰ্তন?

ইয়ে-মানুষ তো মানে, এককালে বাঁদরই ছিল।

যাঃ, তুমি বড়ো আজেবাজে বকছ, মৃগাঙ্কদা। এ ধরনের রসিকতা ভালো লাগে না। আমি চলি আপিসে। সাড়ে পাঁচটায় এসে তোমাকে নিয়ে যাবো।

সন্ধ্যায় নীলরতনের সঙ্গে কীর্তন শুনতে গিয়ে মৃগাঙ্কবাবু একটা আশ্চর্য জিনিস অনুভব করলেন। তাঁর বারবার মনে হতে লাগল যেন বাঁদরের দলই খোল করতাল বাজিয়ে গান গাইছে। এ এক অদ্ভুদ অভিজ্ঞতা।

কীর্তন থেকে ফিরে এসে খাওয়াদাওয়া সেরে নীলরতন বললেন যে, তাকে একবার মাধববাবুর কাছে যেতে হবে বাঙালীটোলায়।

আধঘন্টার মধ্যেই ঘুরে আসছি, মৃগাঙ্কদা। আমার হোমিওপ্যাথিক ওষুধটা ফুরিয়ে গেছে। উনি ডাক্তার-নিজেই ওষুধ বানিয়ে দেন।

নীলরতন চলে যাবার পর মৃগাঙ্কবাবু বুঝতে পারলেন যে, তাঁর একবার বাঁদরের মতো হেঁটে দেখতে ইচ্ছা করছে। খাটের পাশে মেঝের ওপর উপুর হয়ে সামনের হাত দুটাকে পায়ের মতো ব্যাবহার করে মৃগাঙ্কবাবু ঘরে কয়েকটা চক্কর মারলেন। বার চারেক চক্কর খাবার পর ঘরের দরজায় চোখ পড়তে দেখলন নীলরতনের চাকর রামলাল চোখ ছানাবড়া মুখ হা করে চৌকাঠের ঠিক বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

ইয়ে- অত অবাক হবার কী আছে? কাশিতে থাকিস আর বাঁদর দেখিসনি কখনও?

রামলাল কিছু না বলে ঘরে ঢুকে বিছানা করতে লাগল।

মৃগাঙ্কবাবু বাকি যে ক'দিন কাশিতে ছিলেন, সে ক'দিন প্রায় কথাই বলেননি।

কী হল, মৃগাঙ্কদা- আপনি ওমন চুপ মেরে গেলেন কেন? শরীর-টরীর খারাপ হয়নি তো?

শরীর- ইয়ে- কই শরীর তো ঠিকই আছে। মানে, আসলে- ইয়ে- বাঁদর থেকে মানুষ যেমন হয়- তেমনই মানুষ থেকে বাঁদর- মানে, বিবর্তনের উল্টো আর কী?

নীলরতন বেশ অবাক হয়ে গেলেন- যদিও খুলে কিছু বললেন না। মৃগাঙ্কদার কথাটা ঠিক আছে তো? একবার মাধব ডাক্তারকে দেখালে হতো না?

দুদিন পরে মৃগাঙ্কবাবু কলকাতা ফিরে এলেন। হাতে সুটকেস নিয়ে হাজরা লেনে তার বাড়িতে ঢুকতেই সামনে চাকর দাসরথি পড়ল।

বাবু ফিরেছেন? সব মঙ্গল তো?

হুপ।

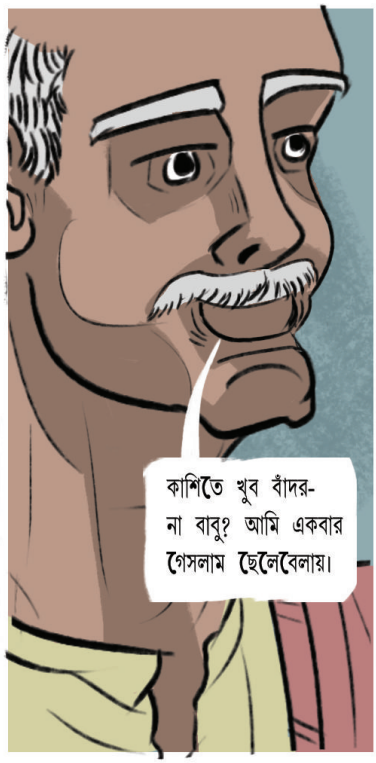
কাশিতে খুব বাঁদর-
না বাবু? আমি একবার
গেসলাম ছেলেবেলায়।

হুপ।

এই ঘটনার চারদিন পর কলকাতার সব খবরের কাগজেই খবরটা বেরোল। চিড়িয়াখানার একজন কর্মচারি গতকাল ভোরে শিম্পাঞ্জির খাঁচার সামনে মাটিতে একটা বাঁদর শ্রেনী জীবক পড়ে থাকত দেখে। জানোয়ারটা ঘুমাচ্ছিল। বোধ হয় মাঝরাত্তিরে পাঁচিল টপকে ঢুকেছে। চিড়িয়াখানার সুপারিন্টেন্ডন জানিয়েছন এই শ্রেনীর বাঁদর আগে দেখা যায়নি। ঘোড়া ও গাধার সংমিশ্রনে যেমন নতুন জানোয়ার খচ্চরের সৃষ্টি হয়, এও হয়তো দুই শ্রেনীর বাঁদরের সংমিশ্রনে সৃষ্ট একটি নতুন প্রানী। প্রানীটি বেঁচে আছে- এবং বাঁদরের মতোই হুপ হাপ কিচির মিচির শব্দ করছে।

সবচেয়ে আশ্চর্য যে বাঁদরটির বাঁ হাতের অনামিকায় একটি আংটি পরানো- তাতে নীলের উপর সাদা দিয়ে মিনে করে লেখা ইংরিজি অক্ষর ‘এম’।

D I B Y E N D U K H A N